**বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩২/ডিসেম্বর ২০২৫**
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.006

# *আকিমুন রহমানের দু'টি উপন্যাস :* নারী-পুরুষ সম্পর্কের ভিন্নমাত্রিক রূপায়ণ

নাহিদা আক্তার*

**সারসংক্ষেপ**

বাংলাদেশের আধুনিক কথাসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ আকিমুন রহমানের (জন্ম ১৯৬০) উল্লেখযোগ্য দুটি উপন্যাস *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে* ও *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি*। লিঙ্গভেদে ব্যক্তির প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, অন্তর্দাহ, অস্থির চাঞ্চল্য ও বিকৃতির নির্মাণের সঙ্গে সমাজসংলগ্ন মানুষের মূল্যবোধের বিপরীতে প্রবৃত্তির প্রতিষ্ঠা, রোমান্টিক মনের প্রণয় নির্ভরতার ফল ও আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাস অনুযায়ী সম্পর্কের পরিণতি উপন্যাস দুটির বিশেষ প্রপঞ্চ হয়ে উঠেছে। সমকালের অন্যান্য ঔপন্যাসিকের তুলনায় আকিমুন রহমানের উপন্যাসের নর-নারীদের মানসগঠন অনেক বেশি কামনির্ভর। গতানুগতিক যৌনতত্ত্ব ও নীতির অনুশাসনে উপন্যাসের চরিত্রসমূহের সম্পর্কসূত্র ব্যাখ্যা করা কঠিন। তিনি নারীর সঙ্গে পুরুষ এবং নারীর সঙ্গে নারীর বিবিধ সম্পর্কের বিভিন্ন দিক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে তাদের জৈব-মানবিক সত্তাকে মূল্যবোধাশ্রয়ী প্রথাগত সমাজের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। এই প্রবন্ধে *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে* ও *রক্ত পুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি* উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্ক বিষয়ে লেখকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত মূল্যায়নে সামাজিক সংস্কৃতির প্রভাব ও মনোবৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধানের প্রয়াস রয়েছে।

**চাবি শব্দ :** আকিমুন রহমান, উপন্যাস, নারী-পুরুষ সম্পর্ক।

স্বাধীনতাত্তোর সময়ের বাংলা কথাসাহিত্যে প্রগতিশীল ধারার লেখক আকিমুন রহমান। পুরুষকে প্রতিপক্ষ না ভেবে পরিপূরক ভেবে আসা আকিমুন রহমানের উপন্যাসে ব্যক্তির অস্তিত্বজনিত সংকট, মানবিকবোধের উচ্চকিত ধারণা ও নিঃসঙ্গতার মতো অসহ্য যন্ত্রণার প্রচলসত্য খুঁজে পাওয়া যায়। লেখালেখির শুরু থেকেই তিনি প্রজন্মান্তর ধরে চলে আসা নারী ও পুরুষের আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কের মধ্যে বৈষম্যময় অস্বস্তিকর প্রসঙ্গগুলোকে চিহ্নিত করে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছেন নারীর শরীরকেন্দ্রিক নানাবিধ ট্যাবু, সামাজিক শৃঙ্খলা নির্মাণে পুরুষের ভূমিকা, নর-নারীর সম্পর্কে নারীর অধিকার স্থাপনের প্রক্রিয়া। 'ব্যক্তির বর্হিলোক ও অন্তর্লোক নির্মাণে আকিমুন রহমান কল্পনা নয় নির্ভর করেন বাস্তবভিত্তির ওপর।'[১] সংসারে নর-নারীর সম্পর্ক যাপনের প্রথা, কর্মক্ষেত্রে নর-নারীর লিঙ্গভিত্তিক মূল্যায়ন ও পরিবার-ধারণার প্রথাগত চিন্তায় তিনি সমাজের একেবারে প্রান্তীয় অঞ্চলসমূহ হতে দেখেছেন হাজার বছর ধরে চলে আসা সামাজিক শাসনের অসংগতিময় রূপের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব। ব্যক্তিজীবনে তিনি শিক্ষক ও গবেষক। তাঁর সম্পর্কে বেগম আকতার কামাল বলেন, 'তিনি দায়িত্ব নিয়ে লেখেন। তিনি সমাজকে ভাঙতে চান। বর্তমানে নারী সম্পর্কে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। এই ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছেন আকিমুন রহমান।'[২] সাহিত্যে নারী-পুরুষের সম্পর্ক রূপায়ণে সামাজিক নীতির সত্যাসত্যের সঙ্গে প্রবৃত্তির যে

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।

নিঃসংকোচ সহাবস্থান আকিমুন রহমান নিশ্চিত করেছেন তা *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে* (১৯৯৭) ও *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি* (১৯৯৯) উপন্যাসদ্বয়ে ব্যক্তির অন্তর্জাগতিক ক্রোধ-প্রতিরোধ-আবেগ-ঘৃণা-অনুরাগের স্তর অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে সম্পর্কসূত্রের এক অনবদ্য জীবনভাষ্য।

## নীতি ও প্রবৃত্তি

নীতি শব্দটি দ্বারা ন্যায়সংগত বিষয় বা সমাজের কল্যাণকর বিধানকে বোঝানো হয়। সংঘবদ্ধ হয়ে সমাজে বসবাস করার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের কিছু আচরণ ও অভ্যাস নিন্দিত ও কিছু আচরণ ও অভ্যাস প্রশংসিত হয়। কল্যাণকর ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে মানুষকে যেসমস্ত সামাজিক সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা মানতে হয়, সেই নির্দেশাবলির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সত্যই নীতি বা Ethics। নীতির তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ, নৈতিকতা সম্পর্কিত নানা প্রসঙ্গ নীতিবিদ্যা নামে দর্শনশাস্ত্রে আলোচিত হয়। দার্শনিক William Lillie নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন :

> We may define Ethics as the normative science of the conduct of human beings living in societies a science which judges this conduct to be right or wrong, to be good or bad, or in some similar way.[৩]

ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, উচিত-অনুচিত, কর্তব্য-অকর্তব্য, ভুল-শুদ্ধ, বাস্তব-অবাস্তব, মঙ্গল-অমঙ্গল, সুন্দর-কুৎসিত, ইত্যাদি বিষয়ক সকল প্রশ্ন ও সমস্যা সমাধানের প্রয়াস রয়েছে নীতিবিজ্ঞানে। সমাজে এক ব্যক্তির প্রতি অপরের 'নৈতিক বাধ্যবাধকতা' না থাকলে সৃষ্টি হয় সামাজিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। মানুষের নৈতিকতাবোধের সমান্তরালে অবস্থান প্রবৃত্তির। মূলত, যে আদিম ও মৌলিক চাহিদাগুলো আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে, মানসিক শক্তি (Psychic energy) রূপে কাজ করে, ফ্রয়েড তারই নাম দিয়েছেন প্রবৃত্তি বা Instinct। প্রবৃত্তি দুই ধরনের : ১. কাম প্রবৃত্তি বা Eros, ২. মরণ প্রবৃত্তি বা Thanatos। Eros বা কাম প্রবৃত্তি আমাদের মনে অন্য ব্যক্তি ও বিষয়ের প্রতি মিলনের আকাঙ্ক্ষা (erotic desire) সঞ্চার করে।[৪] নৈতিক জীবনের লক্ষ্য নিরূপণের ক্ষেত্রে Instinct বা সহজাত প্রবৃত্তির রয়েছে সীমাহীন কর্তৃত্ব। দার্শনিক প্লেটোর মতে 'যখন আমরা যুক্তি এবং বুদ্ধি দিয়ে আমাদের আবেগপ্রবণ পশুবৃত্তিটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তখন আমরা এই Ethical Virtues বা নৈতিকগুণের সন্ধান পাই।'[৫] এই Ethical Virtues তৈরি করে সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি। সম্পর্কভেদে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রবৃত্তিক ও নৈতিক আচরণের প্রকাশ দেখা যায়। নারী-পুরুষ সম্পর্ক একই সঙ্গে নৈতিক এবং প্রবৃত্তিগত। বাধ্যবাধকতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য ছাড়াও নারী ও পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে চলমান স্নেহ, শ্রদ্ধা, বন্ধুত্ব, ঈর্ষা, ক্রোধ, জিঘাংসার মতো অনুভূতি বিশ্লেষণের প্রয়াস থেকেই সাহিত্যতত্ত্বে সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক এ প্রসঙ্গগুলো আলোচনাযোগ্য হয়ে ওঠে।

## নারী-পুরুষ সম্পর্ক: নানামাত্রিক দৃষ্টিকোণ

সমাজ সংগঠনে নারী-পুরুষের যৌথ ভূমিকা অনিবার্য। সৃষ্টির শুরু থেকেই নর ও নারীর সম্পর্ক রূপান্তরশীল। তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার অন্বয় প্রথমত নৃ-তাত্ত্বিক। সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে সে সম্পর্ক ধর্মীয়, মনস্তাত্ত্বিক এবং সবশেষে রাজনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতেও

ব্যাখ্যা করার উপযোগিতা তৈরি হয়েছে। নারী-পুরুষ সম্পর্কে নীতি ও প্রবৃত্তির চর্চা পুরুষ ও নারীভেদে দেখার দৃষ্টি ভিন্ন। দুই দেখার মধ্যে সারগত, পদ্ধতিগত, কাঠামোগত ও তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য সুস্পষ্ট। নারীর নৈতিকতা, প্রবৃত্তিগত চাওয়ার সঙ্গে পুরুষের প্রতি যত্ন, আবেগানুভূতির মূল্যায়ন ও সহানুভূতিশীল আচরণ জড়িত। অন্যদিকে নারীর প্রতি পুরুষের নৈতিকতা ন্যায্য অধিকার ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। নারী-পুরুষ সম্পর্ক তত্ত্বীয় সকল শাখায় 'লিঙ্গ বৈষম্য' (gender discrimination) অভিধায় আলোচিত হয়। নৃবিজ্ঞানীদের দ্বারা পুরুষ আধিপত্যের ইতিহাস আবিষ্কারে 'Sex' এবং 'Gender' শব্দ দুইটির অর্থগত পার্থক্যের মধ্য দিয়ে লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টি প্রথম আলোচনায় আসে। ইংরেজি শব্দ 'Sex' অর্থ মানুষের জৈবিক পরিচয়, অন্যদিকে 'Gender' অর্থ প্রজননগত পরিচয়। মাতৃতান্ত্রিক যুগে নর-নারীর সম্পর্কের সাম্যাবস্থা থাকলেও ধনতান্ত্রিক যুগে এসে নারীর জৈবিক পরিচয় প্রজননগত পরিচয়ের কাছে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই পুরো প্রক্রিয়াটি 'পিতৃতন্ত্র' নামক রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে শ্রম-বিভাজন ও ক্ষমতার কাঠামোয় নারীর দ্বিতীয় অবস্থান নিশ্চিত করে তাকে নিম্নবর্গে ঠেলে দিয়েছে। নর-নারীর বহুরূপ সম্পর্কের মধ্যে এমন কিছু সম্পর্ক রয়েছে যেখানে সকল ধর্মমতেই প্রবৃত্তিগত চিন্তা অকার্যকর। পবিত্র কোরাআনের সুরা নিসায় বলা হয়েছে:

> তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নী, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুগ্ধ-মাতা, দুগ্ধ-ভগিনী, শাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাহার সহিত সংগত হইয়াছে তাহার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তাহার গর্ভজাত কন্যা, যাহারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে।[৬]

সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সম্পর্কগুলো নৈতিক জীবনচর্চার ভার বহন করে। আবার নর-নারীর মধ্যে বিদ্যমান কিছু সম্পর্কের সম্পূর্ণ ভিত্তিই সামাজিক। প্রতিবেশী, সহপাঠী, সহকর্মী, সহযাত্রী, নিকটাত্মীয় বা স্বল্প পরিচিত নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে সৌজন্যবোধই নৈতিকতা, সেখানে অপরপক্ষের আগ্রহ বা অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবৃত্তিগত আচরণ প্রকাশ নিপীড়নের নামান্তর। তবে এও সত্য 'পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সাধারণভাবে গৃহীত মতবাদ অনুযায়ী নারী-পুরুষের সম্পর্ক মূলত দেহভিত্তিক। নারীদেহ হলো পুরুষের কর্ষভূমি।'[৭] মনোবিজ্ঞানীগণও নর-নারীর সম্পর্কের ভিত্তিতে যৌনতাকে রেখেছেন প্রধান বিচার্যে। রাষ্ট্র ও সমাজভেদে যৌন সম্পর্কে রয়েছে বিবিধপ্রকার বৈধ-অবৈধতার বিচার্য মান। এদেশের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ, সামাজিক সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রদর্শনে বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক স্বীকৃত নয় এবং বিয়েকে মনে করা হয় স্বামীর কামপূরণের স্থায়ী চুক্তি। কামনির্ভর সম্পর্কের মধ্যে দাম্পত্য ও পরকীয়ার প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে আলোচনাযোগ্য। আবার দেহগত সম্পর্ক অনুপস্থিত রেখেও নর-নারীর মধ্যে ভাবাবেগপূর্ণ হার্দিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার স্বাভাবিক প্রবণতা সকল সময়, সকল সমাজের মধ্যেই প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু সামাজিক রীতির ভিন্নতা অনুসারে কোনো কোনো সমাজে বিবাহপূর্ব প্রণয় তথা যৌন সম্পর্ক বিগর্হিত ও নিন্দনীয়। প্রাক্-বৈবাহিক প্রেম ও যৌনতা ইউরোপীয় সমাজে সাধারণভাবে সমর্থিত হলেও প্রাচ্যদেশীয় সমাজে এটি পাপ বলে বিবেচিত। যদিও 'আধুনিক শিক্ষা এবং বিয়ে ও যৌন আচরণ বিধি পশ্চিমা প্রকল্পের অংশ। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, গোটা ব্যাপারটাই পশ্চিমা ষড়যন্ত্র।'[৮] বাংলাদেশের সমাজ দর্শনে পুরুষের প্রভাবশালী স্বভাবধর্ম এদেশের নর-নারী সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। নারীর এই অবনত রূপ

কেবল বর্তমান সময়ের নয়। *মনু সংহিতায়* বলা হয়েছে 'পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত রক্ষতি যৌবনে। রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্র ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'[৯] অর্থাৎ কুমারীকালে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্ররা রক্ষা করবে নারীকে; নারী স্বাধীনতার অযোগ্য। স্নেহ, মমতা ও কর্তব্য, সম্পত্তি বণ্টন, নিরাপত্তা দানের বাঁটোয়ারায়ও নারীর এই মূল্যমানহীন অবস্থাই দৃশ্যমান। এই পরিণতি পুরুষের উপার্জন সক্ষমতা ও নারীর গৃহাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষের লৈঙ্গিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে। নর-নারীর সম্পর্কের বিবিধ প্রপঞ্চের সংঘাতময় অবস্থান চিহ্নিতকরণে অগ্রগণ্য ভূমিকায় আছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোর কথাসাহিত্যিকগণ। সমকালের অন্যদের মতোই আকিমুন রহমানও *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে* (১৯৯৭) ও *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি* (১৯৯৯) উপন্যাসে অনুসন্ধান করেছেন কামসক্ষম নারী ও সুযোগসন্ধানী পুরুষের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্কের ব্যক্তিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি। বাদ পড়েনি ধর্মীয়-রাজনৈতিক জটিলতা; সর্বোপরি মনোবিকলন, যৌনতাবোধ আর শেষত নারীর আত্মগত পরিচয়ে উন্নীত হবার সর্বগ্রাসী প্রবণতা।

## পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে : হৃদয়হীন প্রবৃত্তির আখ্যান

'আমার ভেতরে অফুরান করে দেয় ইতর আঁধার ডিঙোবার ক্রোধ'[১০]—*পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে* উপন্যাসের উৎসর্গ পাতায় এভাবেই নিজেকে প্রতিস্থাপন করে এক নারীর জীবনে বুনো পুরুষের নির্মমতাজাত নিরুক্ত বক্তব্যের অনুচ্চার্য বহুতর বিপন্নতার সঙ্গে নিজের আত্মসত্তার অভিন্ন রূপ অনুভব করেছেন আকিমুন রহমান। তীক্ষ্ণ মনোবীক্ষণের দুঃসহ বোধে বিধ্বস্ত উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শামীমা। তার যে পৃথিবীতে বিচরণ সে পৃথিবীতে পুরুষ পরিচয়ে নিয়ত বদলে যায় ছেলেবন্ধু, ভাই, মামা, স্কুলের শিক্ষক, মায়ের স্বামী; পিতা। শামীমা জেনেছে প্রভুতুল্য স্বামীর নির্দেশ পালন ও গৃহকর্মে নিপুণা হয়ে ওঠার সঙ্গে যমজ পুত্রসন্তান জন্মদানের পরিপ্রেক্ষিতে তার মা সংসারের একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হয়ে ওঠার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। পিতার সঙ্গে তার নৈতিক সম্পর্কের অংশীদারত্বও এমন : জন্মের পর পরই 'তরুণ পিতার মুখ অপমানে ও আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় অন্ধকারে ছেয়ে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সে চাকুরিস্থলে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে।'[১১] বাঙালি সমাজে পুরুষের স্ত্রী গ্রহণের সারকথাই মূলত এই পুত্রলাভ। 'ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ সেই নারীকেই উত্তম বলে যে নারী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করে, পুত্র সন্তান জন্ম দেয় এবং স্বামীর কথার ওপর কথা বলে না।'[১২] শামীমার পিতা অফিস থেকে ফিরেই তার ছোট ভাই রতন ও খোকাকে পড়তে বসায়, শামীমা বই খাতা নিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে যখন বলে 'আব্বা আমিও পড়ব'[১৩], প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, 'তুই আর ঝামেলা বাড়াইস না ত'[১৪]। কার্যত, পারিবারিক প্রতিবেশে পিতার নিকট থেকে অপর দুই সহোদরের মতো সমান মমতা ও আশ্রয় পাবার অধিকার তার জন্য ছিল অনভিপ্রেত। শামীমার স্বাভাবিক চলার গতিবিধিতেও মুহূর্মুহূ কড়া শাসন প্রকাশ, অযাচিত হুংকারই ছিল কেবল পিতৃত্বের কর্তব্য। তার এরূপ আচরণ যতটা ব্যক্তিতান্ত্রিক তারচেয়ে বেশি সমাজতান্ত্রিক। যদিও বাৎসল্যের টানই পিতা-পুত্রীর সম্পর্কের শেষ গন্তব্য হওয়ার কথা কিন্তু আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় কন্যাকে যথাসময়ে পাত্রস্থ করার সমস্যা, তার শরীর ও মনের সুরক্ষা দানের প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে তাকে প্রায়ই পিতার গলগ্রহ মনে করা হয়। এছাড়া ধর্মীয় বিধান মতে পুত্র-নির্ভর সম্পত্তি বিলি-

ব্যবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের সঙ্গে পিতা-মাতার অবস্থানজনিত রীতি কন্যাকে রেখেছে আরো পশ্চাৎপদ। কারণ :

> ব্যক্তিগত সম্পত্তির শুরু যে নারীকে মালিক করতে পারেনি তার কারণ সম্ভবত এই যে, নারী তার আগেই পরাজিত, শৃঙ্খলিত হয়েছে। নারীর সন্তানকে এবং সেহেতু নারীকে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা এবং সমাজের সম্পদ কর্তৃত্বশালী পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করাটা তাই পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।[১৫]

স্বভাবতই বৈষম্যময় এই পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া শামীমাদের ভুগতে হয় নানাবিধ শোষণ তাচ্ছিল্য ও অমর্যাদায়। *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে* উপন্যাসেও এর অন্যথা হয় না।

শামীমার বঞ্চনা, প্রত্যাশা, নিঃসঙ্গতার সঙ্গে অনিবার্যরূপে জড়িয়ে আছে নারীপ্রসঙ্গ। শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে এলে নারী জন্মের দুঃসহ অবস্থান শামীমাকে যে জগতে ছুঁড়ে মারে সে জগতে তার গোপন অনালোকিত অধ্যায় প্রতিমুহূর্তে পরিবারে অবস্থানরত ও আগত অপরাপর পুরুষের দাঁত নখ চোখ ও ক্রূর চাহনি দ্বারা হয় বিদ্ধ। সামাজিক নির্মাণে এমনকি রক্ষণশীল গণ্ডিবদ্ধ পরিবারেও নারীর জন্য সামান্য স্থান রাখা হয়নি যেখানে নারীর গোপন বিষয়গুলো শুধু নারীর থাকে। বিকৃত পুরুষ অলিখিত প্রভুত্বের অধিকারে নারীর সংবেদনশীলতায় বপন করে ঘৃণার বীজ। শামীমার শিক্ষালাভের পথে সংগ্রামে আয়ত্ত করা যে গৃহশিক্ষক মফিজ, সেও শামীমার সঙ্গে নৈতিক সম্পর্কের ভিত্তি সুদৃঢ়করণে আগ্রহী হয়ে ওঠেনি। প্রবৃত্তি তাকে তার আদর্শিক জায়গায় স্থির হতে দেয়নি বলেই পুরুষতান্ত্রিক পেষণে শামীমার শরীর ও মনকে আহত করে মফিজ নামক নরপশু। শামীমা বীজগণিতের মুখস্থ সূত্র বলতে গেলে মফিজ তা শোনে না, বরং গণিত রেখে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান খুলে 'ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ছুতোয় ফেনিয়ে ওঠে- ব্রেসিয়ার শব্দটি উচ্চারণ করে চলেন।'[১৬] তার ভাই, বন্ধু, প্রতিবেশী সকল পুরুষের কাছেই সে জলজ্যান্ত প্রবৃত্তির আগুন। তার মহাবন্ধু নান্টু, দুপুরে তার বাবার টিফিন নিতে আসা পিয়ন সামাদ সকলেই কোনো না কোনোভাবে শামীমার খোলা গলায় আঙুল ঘষে লালায়িত জিভের জড়ানো রসনায় চরিতার্থ করে বিকৃত যৌনতার স্বাদ। সমালোচকগণ মনে করেন :

> নারীর প্রতি আগ্রাসী হতে গিয়ে যে-প্রবণতাটি পুরুষের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে সেটি হচ্ছে নারীনির্যাতন। নারী নির্যাতনই হচ্ছে মূলত যৌনবাদ; যৌনবাদে উগ্র যৌনতারই প্রাধান্য, মানবিক সম্পর্কের নয়।[১৭]

বড় হতে হতে প্রতিনিয়ত এসমস্ত প্রবৃত্তিগত পীড়ন শামীমার মনোজগতে সৃষ্টি করে পুরুষকেন্দ্রিক ট্রমা। মানসাঘাত বা psychic trauma হচ্ছে ব্যক্তির অবচেতনে সঞ্চিত হওয়া অস্বাভাবিক ঘটনার বিরূপ প্রতিক্রিয়া।[১৮] ফলে, দরজা বন্ধ না করে ঘুমুতে না পারা শামীমা কেবলই অনুভব করে তার চারপাশে জমাটবাঁধা অজস্র পুরুষ নারীভোগের জন্যই অপেক্ষমাণ। জীবনের প্রয়োজনে তাকে যখন যেতে হয় গ্রাম থেকে শহরে, তখন বাসের মধ্যে কারো একটি কনুই খুঁজে বেড়ায় শামীমার অন্ধিসন্ধি, কেউ ঘুমের মধ্যে মাথা হেলিয়ে দেয় তার ওপর। কর্মজীবনের স্ব-উপার্জন শামীমাকে সুখী করলেও সহযোগী রূপে সহকর্মীর প্রতি সহকর্মীর যে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ, সংবেদনশীলতার প্রত্যাশা তা তার জীবনে বাস্তব হয়ে ওঠেনি। পথশিশুদের নিয়ে কাজ করা শামীমাদের সংগঠনটি দৃশ্যত মানবিক প্রতিষ্ঠান হলেও কিশোরী মেয়েদের সাময়িক অবস্থানের জন্য 'ড্রপ ইন সেন্টার'

খোলার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজারের কিশোরীদের এবিউজের ঘটনা তাকে হতবাক করে। মেয়েরা তাকে জানায় : 'ম্যানেজার ভাইয়ায় খালি আমাগ বোক টিপে। আমারটা টিপে, পারুলিরটা টিপে, বেদেনারটা টিপে, যখন যারটা টিপতে মোন চায় হেরে কাছে নিয়া হগলতেরে দেহাইয়া দেহাইয়া টিপতে থাকে।'[১৯] পুরুষের এই অনৈতিক যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে একা দাঁড়ায় শামীমা, জড়িয়ে পড়ে নারী-পুরুষকেন্দ্রিক লৈঙ্গিক দ্বন্দ্বে। কো-অর্ডিনেটরের কাছে অভিযোগনামা জমা দিলে তাকেই উল্টো ষড়যন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের কাছ থেকে পেতে হয় শোকজ লেটার, চাকরিচ্যুতির হুমকি। উপরমহলের তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তকে যখন সাময়িক বরখাস্ত করা হয় তখন তার প্রজেক্টের কো-অর্ডিনেটর তার পুরুষ সহকর্মীর প্রতিই সহমর্মী হয়ে ওঠেন। এবং বলেন 'এই হুট কইরা ম্যানেজার ভাইরে বরখাস্ত করলে ওয়াইফের কাছে তার প্রেস্টিজ কই থাকে। সে কি কজ দেখাইব ফ্যামিলিতে? স্যার এ মানবিক দিকগুলা কনসিডার করেন।'[২০] কিন্তু উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যখন ন্যায়সংগত বিচারে ম্যানেজারকে বহিষ্কার করে শামীমাকে ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজারে পদায়ন করেন, তখন তার বিরুদ্ধে রটানো হয় কুৎসা। শামীমাকে তার কাজের বুয়া বলে :

> আফা গোফন কথা হোনেন। কোঅর্ডিনেটর বাই আফনের নামে কুকথা কইতাছে। হগলতের কাছে। হেয় দারোয়াননরে কইছে আফনে বোলে শইল দিয়া বিগ বসরে কাইত করছেন। হগলতেই কইলাম এই কথা বিশ্বাস করতাছে।[২১]

সাধারণত আমাদের সমাজে পুরুষের সঙ্গে পুরুষ যে আচরণ করে একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নারীর সঙ্গে করে সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ। এর কারণ মনস্তাত্ত্বিক। মূলত :

> মেধা ও প্রতিভার মধ্য দিয়ে কর্মক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গেলেই পুরষের পৌরুষত্ব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নারী সেজেগুজে নিজেকে প্রদর্শন করলে তাতে মেধা নয়, নারীর শরীর, অর্থাৎ যৌনতা প্রধান হয়ে ওঠে; পুরুষ নারীকে এই রূপেই দেখতে চায়। কিন্তু আপন প্রতিভা ও মেধার গুণে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবে, এতেই পুরুষের যত আপত্তি।[২২]

অন্যদিকে চাকরির সুবাদে আসা নতুন পরিবেশে শামীমা তার আবাসিক স্থানটিকে নির্ঝঞ্ঝাট রাখতে পারে না। ভুঁড়ি বের করা উদোম শরীরের হোদল কুতকুতে চেহারার বিচিত্র পুরুষ, বিচিত্র সময়ে ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে, গলায় পাউডার মেখে, হাঁটুর উপরে লুঙ্গি তুলে, ঘেমো শরীরে লাইফবয়ের দুর্গন্ধ সমেত এসে পরিচয় দেয়— 'আমি আপনের নেইবার।'[২৩] শামীমাকে দেখে শুনে রাখা একজন রক্ষক পুরুষের অভাবে এরূপ উটকো অতিথিদের আনাগোনায় ভারী হয়ে ওঠে শামীমার চারপাশ। অবশেষে পুরুষের জগতে পুরুষের অসহযোগিতায়ই শামীমা উপলব্ধি করে তার একজন ব্যক্তিগত পুরুষ প্রয়োজন।

শামীমার জীবনে পুরুষের প্রতি নারীর যে নৈকট্যের অনুভূতি, যে প্রেম—তা মনিরুল নামক এক বিশেষ মানুষকে ঘিরে প্রথম প্রস্ফুটিত হয়। পেশায় দন্ত-চিকিৎসক মনিরুলের রসবোধ, লোকসমাজে সাবলীল থাকার ভঙ্গি ও শামীমার প্রতি আলাদা মনোযোগ শামীমার নৈঃসঙ্গ্যলোক আলোড়িত করে। পরবর্তী সময়ে 'কি সুইট একটা মুখ'[২৪] 'কি ফাইন একটা ফিগারে'[২৫]র মতো স্তুতি 'প্রেম' নামক অনুভূতিতে শামীমাকে পুরোপরি গ্রাস করে। প্রেম প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী হ্যাভলক এলিস (১৮৫৯-

১৯৩৯) তাঁর *Studies in the Psychology of Sex* (1933) গ্রন্থের একটি মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন, 'সাধারণভাবে যৌন আবেগের অভিব্যক্তি যখন প্রশংসাত্মকরূপে প্রকাশ পায় তখন তাকে প্রেম বলা হয়।'[২৬] বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮) উপন্যাসে যাকে 'এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে–এ ভোগ, এ সুখ নহে–এ মন্দার ঘর্ষণ পীড়িত বাসুকি নিঃশ্বাস নির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরি ভাণ্ড নিঃসৃত সুধা নহে।'[২৭] বলেছেন, অনুরূপ রূপের আড়ালে পাত্র-পাত্রীর কামতৃষ্ণার প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল উপন্যাসেই কম-বেশি দেখা যায়। আকিমুন রহমান নারী-পুরুষের এ দিকটা এড়িয়ে গেলেও পুরুষের প্রবৃত্তিগত অনুষঙ্গে নারীর রূপকে তিনি ব্যবহার করেছেন ভিন্ন দিক থেকে। আজীবন কুরূপের জন্য ভর্ৎসনা, তাচ্ছিল্য, বিয়ে না হওয়ার দুঃখ শামীমা ভুলে যায় কামুক পুরুষের চাতুরিময় স্তুতিতে। প্রথম চুম্বনে অস্বস্তি হলেও শরীরের ডাকে ছেড়ে দেয় অপর শরীর, অতপর শামীমা ভাবে :

> তাহলে ভালোবাসা, এতোদিনে তোমার আসার সময় হলো আমার কাছে! আমার গ্রীবা গর্ব ও পুলকে ফুলে ওঠে। ঘৃণায় আমার শরীর তপ্ত হয়ে ওঠে। এইভাবে, এমনভাবে এমন টেনেহিঁচড়ে চটকে মটকে আসে নাকি প্রেম![২৮]

নারী ও পুরুষভেদে প্রেমের রূপ আলাদা। পুরুষ প্রেমকে দেখে দূরবর্তী অবস্থা থেকে, নারী তাকে ধারণ করে সমস্ত সত্তায়—একারণে *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে* উপন্যাসে শামীমা ও মনিরুলের প্রেমে পড়ার স্থিতি, সংকট ও বিচ্ছেদ লিঙ্গভেদে আলাদা আলাদা গন্তব্যে পৌঁছে। শামীমার শরীর পছন্দ করতে শুরু করে মনিরুল। সম্পর্ক টেনে নেওয়ার নৈতিক কর্তব্য, যত্ন ও গুরুত্ব একা পালন করে শামীমা। মনিরুলের ঔদাসীন্য, তাচ্ছিল্য, শরীরের ওপর স্বৈর-আধিপত্য তাকে আহত করলেও মনিরুল নামক প্রভুকে বাঁধা দেওয়ার সাধ্য ছিল না শামীমা নামক নিগৃহীতার। ফলে প্রেমিক পুরুষের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস তাকে দীর্ঘমেয়াদি প্রতারিত হওয়া বিস্বাদময়জীবনের দিকে ঠেলে দেয়। অচিরেই শামীমা তার শরীরে টের পেতে থাকে নতুন প্রাণের, কিন্তু চতুর মনিরুল সে দায় অস্বীকার করে। বহুগামী, শঠ, প্রতারক সম্বোধনে শামীমাকে বাধ্য করে ওই সামাজিক স্বীকৃতিহীন সম্পর্কের চিহ্ন অপসারণে। শামীমা চেয়েছিল তার অনাগত সন্তান পৃথিবীর আলোয় আসুক, প্রণয়ীর সঙ্গে দাম্পত্যের সূচনা হোক এই অনাগতার মধ্য দিয়েই কিন্তু উপায়হীন শামীমাকে মনিরুল ঠেলে দেয় সমস্তরকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে একা লড়াইয়ে। সামান্য মমতা, সহানুভূতির চিহ্ন তার প্রেমিক পুরুষের মধ্যে ছিল না। বরং এই অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের সময়টিকে সে ব্যবহার করে তার উপচে পড়া হিংস্র লালসা চরিতার্থের সুবিধা হিসেবে। ফলে শামীমাকে প্রেমিক কর্তৃক ধর্ষিত হতে হয় গর্ভকালীন সময়েও। যৌন-বৈকল্য বা Sexual Disorder-এর একটি নিন্দনীয় রূপ এরূপ ধর্ষণ (Rape)। যৌন-ধর্ষকামী (Sexual Sadist) ব্যক্তিরা এরূপ পর্যায়ে যৌনসঙ্গীকে অপরিসীম যন্ত্রণা দিয়ে থাকে, এর নেপথ্যে থাকে ব্যক্তির অধিকারবোধের বহিঃপ্রকাশ ও প্রবৃত্তিগত সুখভোগের বিকৃত প্রকাশ।[২৯] গর্ভবতী ধর্ষিতা শামীমার নতজানু করুণ আর্তি অবশেষে যে আলেখ্যে পৌঁছায় উপন্যাস থেকে তার বর্ণনা :

> আমার শরীর, আমি তোমাকে মেনে নিতে বাধ্য করেছি কী বিপুল দুর্দশা। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমার শরীর, আমি তোমাকে সহ্য করতে বাধ্য করেছি কতো ইতরের দলন-পীড়ন। আমি তোমাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো। [...] এক জ্যান্ত খুদে মাংসপিণ্ডের জন্যে তোমাকে মেনে নিতে চাপ দিয়েছি

> মানুষ হয়ে উঠতে ব্যর্থ হওয়া এক বিকারগ্রস্ত জন্তুর বিকৃতি আর লালসার পীড়ন। তুমি বাঁচো এবার অগাধ সুস্থতার ভেতর। বাঁচো মানুষ বাঁচো তোমার পৃথিবীতে।[৩০]

আপাতদৃষ্টিতে *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে* উপন্যাসে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের পরিণতিতে পুরুষের প্রবৃত্তিসীমায় বিচরণরত নারীর জীবনব্যাপী বার বার নিজের কাছে ফেরা ছাড়া অপর কোনো আশ্রয় চিহ্নিত হয়নি এবং সামাজিক নীতিশাসিত জগতে সম্পর্ক পরিচর্যায় সর্বংসহা নারীর নিজের প্রতি দয়ার্দ্র থাকার প্রেরণা ও নরের প্রতি অন্ধত্ব পরিত্যাগের উৎসাহ এ উপন্যাসে প্রতীয়মান করে তুলেছেন আখ্যানকার আকিমুন রহমান।

**রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি : প্রবৃত্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ নারী-পুরুষ**

নারী-পুরুষ সম্পর্কের জটিলতা এবং সেই সঙ্গে নারী প্রবৃত্তির সাহসী প্রকাশ নিয়ে রচিত আকিমুন রহমানের *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি*। অসংগতিপূর্ণ প্রণয়ের বোধ, অপরিমিত ভোগাকাঙ্ক্ষা, যৌনতা ও যৌন বিকৃতিসহ নারী-পুরুষ সম্পর্কের নানাদিক উন্মোচিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। জৈবিকতা নির্ভর হলেও *রক্ত পুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি* উপন্যাসে আপাত নিম্নস্থ, অর্ধ শিক্ষিত, খুঁতসমেত নারীর নৈতিক জীবন পত্তনের নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে উদগ্র প্রবৃত্তিগত স্পৃহা ও পুরুষ-নির্ভর জীবনব্যবস্থার ওপর আস্থা। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র পারভিন। তার নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত আত্মার অন্তর্ধ্বনিতে উপভোগ্য প্রণয় ও দাম্পত্য অপ্রাপ্তির হাহাকার উপন্যাসের শুরুতেই স্পষ্ট হয় :

> এই যে আমি, আমি এক মেয়ে। আমার বয়স চল্লিশ বছর। চল্লিশ বছর হলে মেয়েমানুষের জীবনের আর থাকে কি? আমার জীবনেও সব শেষ। আশা শেষ। চাওয়া শেষ। পুরুষকে পাবার দিন শেষ। চামড়ার টান শেষ। সব শেষ। অথচ দেখো আমার জীবন সংসারের কোনো নুনের স্বাদ পেলো না।[৩১]

একটা 'নুন' যাকে সুস্থ যৌন জীবনের প্রতিশব্দ মনে করা হয় পারভিনের তা না-হওয়ার আক্ষেপ প্রসঙ্গে হুমায়ূন আজাদের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> কিশোরীকে, তরুণীকে সমাজ একটিই স্বপ্ন দিয়েছে : পুরুষ। কিশোরও স্বপ্ন দেখে নারীর, কিশোরও কামনা করে নারী; তবে তা তার জীবনের খণ্ডাংশ। তরুণীর জীবনের সারকথা পুরুষ, যে পূর্ণ ক'রে তুলবে তার জীবন। এটা কোনো জৈব বিধান নয়; প্রকৃতি তাকে প্রতীক্ষার জন্যে প্রস্তুত করে নি, কিন্তু সমাজ তার জন্যে পুরুষের প্রতীক্ষাকে ক'রে তুলেছে অবধারিত।[৩২]

বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষের আয়ের ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলোয় তাদের আর্থিক সংগতির সঙ্গে পরিবারে চর্চিত মান্য সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ধারা নারী-পুরুষের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ধারণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি* উপন্যাসে সমাজ প্রবণতা, নারী নিগ্রহের সঙ্গে পারিবারিক ক্ষুদ্রবলয়ে আবদ্ধ মানুষের প্রতিদিনের করণীয় আমাদের সমাজব্যবস্থার অনালোকিত প্রথা ও সংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। পারভিনদের বাড়ি বান্ধা বাড়ি। পির-মুর্শিদ তাবিজ-কবজ, জাহেরী-বাতেনী, জ্বিন-পরি, পানি পড়ার মতো কুসংস্কারের প্রতি অন্ধ আনুগত্য দেখা যায় এ পরিবারের সকল সদস্যের। যদিও পির বা মুর্শিদ পূজার কল্যাণে বাড়ির ভিতর-বাহির সমস্ত কিছু ভালো হওয়ার কথা থাকলেও এ বাড়ির একমাত্র

মেয়ে পারভিন পয়াবন্ধ, ছেলে শাহআলম বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী, মা সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত সূতিকা রোগাক্রান্ত। সংসারবিমুখ, নারীমাংসলোভী, বেহিসাবি পারভিনের বাবা কাঁচামাল ব্যবসায়ী। বাজারের মেয়েমানুষ নিয়ে রাতকাটানো আর মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বুঁদ হয়ে থাকা ছাড়া বাদ-বাকি সবকিছুই তার গ্রাহ্য সীমানার বাইরে। মাতা, স্ত্রী, কন্যা, পুত্র কারো জন্যই তার ভেতরে নেই মমতার। গৃহাধীন নারীদের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়েই পারভিনের পিতার এরূপ নির্বিঘ্ন জীবন। মূলত 'শ্রেণীবিভক্ত সমাজের পুরুষতন্ত্র একরকম অভিভাবনের জোরেই নারীর চিন্তা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে'।[৩৩] পারভিনের পিতৃগৃহেও এর অন্যথা নেই। নর-নারীর সুস্থ জৈব-মানবিক সম্পর্ক না-দেখা পারভিন বড় হয় মা ও বুজির মেয়েলি আচার শিক্ষা নামক পীড়নের মধ্য দিয়ে। বুজির মুখে থেকে শরীরের পাক-নাপাক শিখতে শিখতে হীনম্মন্য, নিঃসঙ্গ পারভিন এই সত্য জেনে যায় যে তার 'লোমে ছোমে ভরা শরীর দেখে দুনিয়ার কোনো সোয়ামিপুরুষ ঘিন্না না করে পারবে না।'[৩৪] নিজ শরীরের আকৃতি সন্ধানে পারভিন আরো আবিষ্কার করে তার একটি স্তন অন্যটির চেয়ে ছোট এবং একটি আঙুল অপেক্ষাকৃত অন্য আঙুলগুলোর চেয়ে বড়। এই অসংগতিপূর্ণ শরীর তার একান্ত অধিকারের পুরুষ প্রাপ্তির পথ বন্ধুর করে দেবে কিনা এই শঙ্কা তাকে ভীত করে। এবং প্রতিক্রিয়ায় অস্তিত্বজাত মনোবিকারবোধে পারভিন আগ্রহী হয় পুরুষহীন যৌনাচারে। ফলে ধর্মীয় মূল্যবোধ, সামাজিক অনুশাসনের আবেদন অগ্রাহ্য করে যৌনতা সম্বন্ধে কিছু না জেনেও পারভিন স্বমেহন ও সকামে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। মনোবিজ্ঞান মতে :

> আমাদের অবদমিত বিষয় আপত্তিজনক প্রবৃত্তিগত চাহিদার সঙ্গে যুক্ত থাকে। কখনও কখনও অবদমিত বিষয়ের প্রবণতা হয়, যে ঘটনার মাধ্যমে সে নিজেকে প্রকাশিত করতে পারে তার সঙ্গে যুক্ত না হতে পেরে, নতুন ঘটনাকে আশ্রয় করে তার মাধ্যমে প্রকাশিত হবার।[৩৫]

পারভিন নামক এই নারীর যৌনতার বিচিত্র অভিমুখগুলো পুরুষের সঙ্গে তার অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মনস্তাত্ত্বিক কিছু কারণ উন্মোচন করে। পিতা-মাতার পরিচর্যা, পারিবারিক সংস্কৃতি তাকে পুরুষের সঙ্গে যে সুস্থ মানবিক সম্পর্ক দিতে পারতো সেসমস্তের অভাববোধই তাকে অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়কাতর করে তুলেছে বলা যায়। ক্রমেই তার আগত যৌবনা শরীরে স্বাভাবিক যৌন-এষণায় বিপরীত লিঙ্গের স্পৃহা অনুভূত হয়। এ স্থলে পিতার শরীরই হয়ে ওঠে তার প্রথম উদ্দীপক। যৌনতার ক্ষেত্রে এরূপ বিকাশকে মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড 'ইডিপাস গূঢ়ৈষা' (Oeidipus complex) বলে অভিহিত করেছেন। 'যেহেতু মেয়েদের ইডিপাস-গূঢ়ৈষার সমাধান অসম্পূর্ণ থাকে, তারা একজন পিতৃকল্পকেই তাদের ভালবাসার বস্তু রূপে কামনা করে।'[৩৬] ফলে, পিতার স্পর্শসীমার কাছে গেলে কিংবা পিতার সঙ্গে মায়ের অন্তরঙ্গ দৃশ্যের নিকটবর্তী হলেই পারভিনের শরীর কামজ ক্রিয়ায় প্রণোদিত হয়। উপন্যাসে দেখা যায় :

> পানের ভেজা ঝাঁঝালো গন্ধ সিগারেটের গন্ধ, গোলাপজল আর ধুলোর গন্ধ– সব গন্ধ মিলে অই একজন– আব্বা! [... ] আমার শরীর দুলে ওঠে। আহ-আমার শরীর মুচড়ে ওঠে। [...] আ আ–আমার শরীর কঁকায় দেখি-বস্তিপ্রদেশের নীচের কোন ভিতরে ঘূর্ণিপাক উঠছে দেখি! [৩৭]

আলাউদ্দিন আল আজাদের (১৯৩২-২০০৯) শীতের *শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন* (১৯৬২) উপন্যাসের বিলকিস বানুর গোপনে নিজের ছেলে খোকাকে সম্ভোগরত অবস্থায় দেখে প্রচ্ছন্নরতির

সুখ অনুভবের সঙ্গে পারভিনের এ অনুভূতিকে মেলানো যায়। কিন্তু দাম্পত্য প্রণয়ে মায়ের অপূরণীয় ব্যথার অংশটিও পারভিনের অজ্ঞাত থাকে না।–

> কালো উদ্দাম জিরজিরা আম্মায় দেখি দুই উদাম পা আছড়ায়–নিঃ মুরইদ্দা– নির্বংইশ্যা–পারস না–তুই পারস না–তর হেটামে কুলায় না–ত খায়েশ দেহাস–উদাম আব্বায় কাঁৎ হয়ে দেখি পড়ে থাকে ভোঁস ভোঁস-কথা বলে না।[৩৮]

উপন্যাসে পারভিনের পিতার পরনারী আসক্তি, বেশ্যাগমনের প্রসঙ্গ রয়েছে তাই তাকে পুরোপুরি যৌনবিমুখ বলা যায় না, বরং গৃহবিমুখ বলা যায়। তার এই গৃহবিমুখতার নেপথ্যে তাদের দাম্পত্য যাপনের পারিপার্শ্বিক আনন্দহীন অসুস্থ পরিবেশকে দায়ী করা যায়, কার্যত 'স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার প্রেমহীনতাই যৌন শীতলতা আনে বেশি।'[৩৯] পারভিন তার মাকে স্বামীর সংসার বৈরাগ্যে অসুখী হতে দেখেছে, মুখ নাড়াতে দেখেছে ক্রোধে, কিন্তু সংসার ছেড়ে যাওয়ার মতো মানসিকভাবে দৃঢ়, ব্যক্তিত্ববান হয়ে উঠতে দেখেনি। এর কারণ : 'ভারতে তথা বাংলায় স্বামী পরিত্যক্ত অসংখ্য স্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া গেলেও স্ত্রীদের পক্ষে রুগ্‌ণ, মাতাল, অপারগ, অত্যাচারী কোন স্বামীর কাছ থেকেই স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব ছিল না।'[৪০] পারভিনের জীবনে ধর্ম ও সমাজ অস্বীকৃত প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটে গৃহাভ্যন্তরেই। মায়ের যৌন অতৃপ্তির শব্দ তাকে প্ররোচিত করে বিচিত্রকামে। গৃহপরিচারিকার উদ্ভিন্না যৌবন দেখে পারভিন অনুভব করে নিষিদ্ধ সুখ।–

> ডুব দিয়ে গোসল সেরে ঘাটলার উপর দাঁড়ায় রাহেলা বুবু। বুকে থাকে এক প্যাঁচ ভিজা কাপড়। আঁচলের মাথা দিয়ে ভিজা চুল মোছে ঝাড়ে রাহেলা বুবু। মুছুতে মুছতে কাৎ হয়, পিছনে বাঁকা হয়, সামনে ঝোঁকে। ভিজা মোটা কাপড়ের নীচে দেখো কতো রকমের ভঙ্গী করে [....] দেখতে দেখতে আমার শরীরের মধ্যে আচানক হুড়াহুড়ি পড়ে যায়।[৪১]

এভাবেই শুরু হয় পারভিনের সমকামিতা পর্ব। রাহেলার সঙ্গে উপভোগ্য যৌনতা শেষে পারভিনের উপলব্ধি হয় নারীর জীবনে পুরুষই অনিবার্য। পুরুষকেন্দ্রিক তার যৌন অভীপ্সা প্রথম সত্যিকারের পরিণতিতে পৌঁছায় তাদের বাড়িতে আশ্রিত দাদাজানের পীরভাইয়ের ছেলে জুম্মা কাকার স্পর্শে। সংসার ধর্মে নারীকে প্রতিপালন, যত্ন ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা দান যদি যোগ্য সঙ্গীর কর্তব্য হয়ে থাকে তবে পারভিনের প্রতি সে কর্তব্য পালন করেছে জুম্মা কাকা। জুম্মা কাকার সঙ্গে পারভিনের সম্পর্ককে তাই দুই দিক থেকে ব্যাখ্যা করা চলে। প্রথমত, তার একক চেষ্টায় পারভিন 'ম্যাট্রিক' পাসের মতো দুর্গম পথ পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তার 'ধরাধার্য' পদ্ধতির অব্যর্থ কৌশলে পর্যাপ্ত যোগ্যতা না-থাকা সত্ত্বেও পারভিন মিউনিসিপ্যালিটির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পেরেছে। অংশত পারভিনের পরিবার প্রতিপালনের যে দায় তার পিতার ঘাড়ে ছিল তা বহুলাংশে পালন করেছে জুম্মা কাকা; ফলে পিতার প্রতি পারভিনের মোহগ্রস্ততা ধীরে ধীরে তার অবচেতন মনে শেকড় ছড়িয়ে পরিণতিতে পৌঁছায় জুম্মা কাকার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। একারণে জুম্মা কাকা যখন একলা ঘরে পারভিনকে দুই পায়ের ফাঁকে গেঁথে নেন, অস্থির চাঞ্চল্যে ছানতে থাকেন, তখন পারভিন ভাবে, 'নিজেরে নিয়া খেল, রাহেলা বুবুর সঙ্গে খেল–বড় পানসা, বড়ো ম্যাড় ম্যাড়ে।'[৪২] জুম্মা কাকার সঙ্গে শরীরের এ পরিণতিকে প্রবৃত্তিগত ক্ষুধা রূপে না দেখে পারভিন চেয়েছে সম্পর্কের নৈতিক স্বীকৃতি। মূলত, 'পারভিনের মনের গড়ন আর দশটা

বাঙালি মুসলমান মেয়ের মতোই। তাই পুরুষের সঙ্গে যৌন অভিজ্ঞতাকে বিয়ের রূপ দিতে চায়।'[৪৩] যদিও পিতার মতোই যৌন ব্যর্থতা জুম্মা কাকারও রয়েছে তবু একটা নুনের সংসার, একটু স্নেহময় পরিবেশের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠা পারভিন প্রত্যাখ্যাত হয় জুম্মা কাকার সামাজিক বিচারবোধের কাছে। পারভিন প্রতারিত হয়, একা হয়, বিচ্ছিন্ন হয় পুরুষ সঙ্গ থেকে। সবশেষে সুস্থ স্বাভাবিক বৈবাহিক জীবনের প্রতিশ্রুতিসমেত পারভিনের জীবনে সুলতান আলীর আগমন ঘটলে প্রথমে সে বিব্রত হয়, ধীরে ধীরে পুলকিত এবং সবশেষে বিপন্ন হয়ে সব হারায়। যৌনকামী পারভিনের পুরুষলিপ্সায় যে পাপবোধ তা আত্ম প্রতিষ্ঠাকামী সুলতান আলীর চাতুরিক আশ্বাসে থেমে যায়। শুষ্ক জীবনে নতুন পাতা গজানোর সম্ভাবনায় পরিচর্যাহীন পারভিন নিজেকে গোছায় আবার নতুন করে, শুধু সে একা নয়, বিকৃত, অসুস্থ সংসারে শেকলে আটকে থাকা বয়স্কা দাদি, অসুস্থ মায়ের কাছেও সুলতান আলী হয়ে ওঠে সৌভাগ্যের দেবতা। আর্থিক সামর্থ্যবান, প্রবাস ফেরত, সুদর্শন সুলতান আলী পারভিনকে সহস্রদিক থেকে মোহাবদ্ধ করে বিয়ের পূর্বেই তার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে শারীরিক সম্ভোগের দাবি। পারভিনের কাছে এ প্রত্যাশা অযৌক্তিক নয়। কারণ তার পরিস্থিতি তাকে ভাবতে বাধ্য করেছে : 'কেউ যদি হবু বউয়ের কাছে শরীরের সুখ শান্তি চায়ই, বউ না দিয়ে পারে?'[৪৪] বিয়ের প্রলোভনে 'শরীরভোগ' নারী-পুরুষ সম্পর্কের খুব সাধারণ একটি চিত্র। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও ধর্মীয় বিধান এই অনৈতিক সম্পর্ককে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিবেচনা করলেও প্রায়শই নারীদের আর্থিক-সামাজিক ও শারীরিক দুর্বলতাকে পুঁজি করে এই সুযোগ গ্রহণ করে থাকে পুরুষ। *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি* উপন্যাসে পারভিনের ক্ষেত্রেও এই অবস্থা দৃশ্যমান। অতঃপর পারভিন ছোট বংশের মেয়ে, পারভিন তার রক্ত চুষে খেয়ে শেষ করবে, পারভিনের স্তন একটি ছোট, আরেকটি বড়, সর্বোপরি 'যেই মাইয়ারে তু করতেই কাপড় খুইল্লা চিৎ হয় বিয়ার আগে, অরে আবার বিয়া করন লাগে নি?'[৪৫] এই অজুহাতে পারভিনের আজন্ম সংসার করার বাসনাকে ধূলিসাৎ করে অন্যত্র বিয়ের আয়োজন করে সুলতান আলী। তার এ একপেশে মনোভাবের সাযুজ্যে নারীবাদী লেখক তসলিমা নাসরিনের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যায় :

> বাঙালি মেয়েদের জন্য 'সতীত্ব রক্ষা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ একগামিতা শুধু নারীর জন্য অবশ্যপালনীয়, পুরুষের জন্য নয়। পরপুরুষসংগমে পাতিব্রত্য ধর্মের লোপ হলে সতীত্বনাশ হয়। সামাজিক বৈধতা অতিক্রম করলে নারীকে 'পতিতা' হতে হয়, কিন্তু পুরুষ যথেচ্ছাচারী হলে তাকে 'পতিত' হতে হয় না। একটি পুরুষ যত বহুগামী হোক না কেন, বিয়ে করবার বেলায় কুমারী ছাড়া নৈব নৈব চ।[৪৬]

সুলতান আলীর এ নির্মমতায় পারভিন হতচকিত হয়, ব্যথিত হয়, আত্মহত্যায় প্ররোচিতও হয়, কিন্তু প্রতিরোধী হয়ে উঠতে পারে না। এমনকি সুলতান আলীর শঠতা পারভিন গ্রহণ করতে না পারলেও তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার নির্বাপিত হয় না। এ কারণে নিজের মাকে হত্যা করার পর, দাদির অন্ধ কুসংস্কারের প্রতি সমর্পিত হয়ে তুক-তাক, তাবিজ, কবজে পুনরায় সুলতান আলীকে নিজ জীবনে ফিরিয়ে আনার পথ খোঁজে। সুলতান আলীর পুনরাগমন ঘটেও। ফিরে এসেই পারভিনকে জানায় অন্যত্র বিয়েতে তার শরীরী পূর্ণতা ঘটেনি, প্রয়োজন পারভিনের অভ্যস্ত শরীর। ভরণপোষণ ও অন্যান্য সুবিধাদির বিনিময়ে সে পারভিনের কাছে প্রত্যাশা করে বিয়ে বহির্ভূত যৌন সম্পর্কের সমর্থন। বিমূঢ় এ আবেদনে মুহূর্তেই পারভিনের কাছে মিথ্যে হয়ে যায় মাজার, খাদেম, শরীর, সংসার, তাবিজ, কবজ, পির ও সুলতান আলীর অস্তিত্ব।—

> তারপর সে সুলতান আলীর মুখে জুতার বাড়ি মারতে থাকে।...
> যা-যা-যা-হাড়িচাটা কুত্তা, ছোক ছোক বিলাই, বাইর হ- দূর হ।...
> খোল, খোল তাবিজ পারভিন। আমার হাত পটাং করে তাবিজের সুতা ছিঁড়ে ফেলে। তারপর তাবিজ ছুঁড়ে দেয় আকাশের দিকে– যা মিথ্যা, আসমানের দিকে যা।[৪৭]

মূলত নারী তখনই প্রতিরোধী হয় যখন তার বিশ্বাসের শেষ আশ্রয়ভূমিটাও নিঃশেষ হয়ে যায়। আকিমুন রহমান *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি* উপন্যাসে বিভাগোত্তর বাংলাদেশের গ্রামীণ বাস্তবতায় যে আত্মসুখ সন্ধানী নারী-পুরুষের জীবন অঙ্কন করেছেন তা নারীবাদী পর্যবেক্ষণ থেকে সর্বাংশে নারীর অবদমনের ঊর্ধ্বে উঠে পুরুষের অসম্পূর্ণতা দেখায়। পারভিনের সংসার না-হওয়ার দীর্ঘশ্বাস দিয়ে ঔপন্যাসিক পুরুষের প্রতিপক্ষ থেকে নারীকে সরিয়ে এনে সমাজে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক যৌথবাসের আকাঙ্ক্ষার প্রতি আস্থা দেখিয়ে মূলত নীতি ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে নৈতিক জীবনেরই জয় ঘোষণা করেছেন।

*পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে* ও *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি* উপন্যাস দুটি আকিমুন রহমানের সাহসী নির্মাণ। প্রান্তীয় অঞ্চলের মাঠপর্যায়ের গবেষকের মতো বাস্তবিক উপাত্ত বিশ্লেষণের সত্যে তিনি নারী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে নারীর অন্তর্জগতের ক্ষরণ, দুঃখ নিঃসরণে বহির্জগতের পুরুষের ভূমিকা ও আচরণকে সুনির্দিষ্ট করেছেন। তিনি নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই নীতি বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি পরিচর্যায় দেখিয়েছেন অদম্য আগ্রহ। শুধু নারীকে নয়, পুরুষকেও তিনি ব্যবহার করেছেন নারীর প্রবৃত্তি চরিতার্থের উপকরণ হিসেবে। মনস্তাত্ত্বিক শিল্পরীতির নিরীক্ষায় নারী-পুরুষ সম্পর্কে মনোজাগতিক ঘাত-প্রতিঘাত, আত্মনির্মাণ, আত্মবিসর্জন, সামাজিক সংকট ও নৈতিক অনুশাসনের মতো প্রসঙ্গ চিত্রায়ণে আকিমুন রহমান যুগ-ঘনিষ্ঠ থাকার সক্ষমতা দেখিয়েছেন বলেই সমকালের অন্য ঔপন্যাসিকের তুলনায় তাঁর এ দু'টি উপন্যাস স্বতন্ত্র প্রয়াস হয়ে উঠেছে।

## তথ্যনির্দেশ


১ শফিক আফতাব, *বাংলাদেশের উপন্যাস পটভূমি ও পাঠ পর্যালোচনা*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১৬, পৃ. ১১৮

২ বেগম আকতার কামাল, 'নারী সম্পর্কে নতুন ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছেন তিনি', *(https://ntvbd.com/arts-and- literature/232033/* (accessed : 15 January, 2023)

৩ W. Lillie, *An Introduction to Ethics*, New Delhi, R, N. Sachdev Allies Publishers Private Limited, 1980, p. 2

৪ বনানী ঘোষ, 'অবদমন-প্রসঙ্গে', *সিগমুন্ড ফ্রয়েড*, (সম্পাদক: পুষ্পা মিশ্র), কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১০৫

৫ Ernest Barker, *The Politics of Aristotle*, U.S.A., Harvard Univesity Press, 1961, p. 6

৬ *কোরানসূত্র*, (সম্পাদক: মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৭, পৃ. ১২১-১২২

৭ বিলকিস রহমান, *উনিশ শতকে বাংলায় নারীপুরুষ সম্পর্ক*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০১৩, পৃ. ১৮

৮ মানস চৌধুরী, 'লিঙ্গ, শ্রেণী এবং অনুবাদের ক্ষমতা: বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্ত পরিবার ও বিয়ে', *সমাজ নিরীক্ষণ*, (সম্পাদক: বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর), সংখ্যা ৬৩, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯৭, পৃ. ১০

৯ *মনু সংহিতা*, (সম্পাদক: পঞ্চানন তর্করত্ন), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৩, পৃ. ১৪৮

১০ আকিমুন রহমান, *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে*, ঢাকা, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ৭

১১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

১২ তসলিমা নাসরিন, *নির্বাচিত কলাম*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ১৯

১৩ আকিমুন রহমান, *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
১৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
১৫ আনু মুহাম্মদ, *নারী, পুরুষ ও সমাজ*, ঢাকা, সংহতি প্রকাশন, ২০১২, পৃ. ১৬৯
১৬ আকিমুন রহমান, *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭
১৭ মাসুদুজ্জামান, *পুরুষতন্ত্র ও যৌনরাজনীতি*, ঢাকা, পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স, ২০১৮, পৃ. ২৮
১৮ Sigmund Freud, *Introductory Lecture on Psycho- analysis,* (Edit : Richards A, DicksonA), London, Penguin Books, 1982, p. 80
১৯ আকিমুন রহমান, *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে*, পূর্বোক্ত, পৃ.৬০
২০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫
২১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬
২২ মাসুদুজ্জামান, *পুরুষতন্ত্র ও যৌনরাজনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১
২৩ আকিমুন রহমান, *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২
২৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১
২৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২
২৬ হ্যাভলক এলিস, *যৌন মনোবিজ্ঞান* (অনুবাদ: মুহাম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস), ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ২৩৩
২৭ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'কৃষ্ণকান্তের উইল', *বঙ্কিম উপন্যাস সমগ্র*, চট্টগ্রাম, বইঘর প্রকাশনী, ১৯৮২, পৃ. ৫০৮
২৮ আকিমুন রহমান, *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২
২৯ অরুণকুমার রায় চৌধুরী (১৯৮৪), *অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৩০০
৩০ আকিমুন রহমান, *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১
৩১ আকিমুন রহমান, *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি*, ঢাকা, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৭
৩২ হুমায়ূন আজাদ, *দ্বিতীয় লিঙ্গ*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ. ১৫৪
৩৩ যতীন সরকার (২০০৮), 'বাংলার লোকসমাজে পুরুষতন্ত্র ও নারীচেতনা', *জেন্ডার আলোকে সংস্কৃতি* (সম্পাদনা: সেলিনা হোসেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১২৪
৩৪ আকিমুন রহমান, *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩
৩৫ বনানী ঘোষ, 'অবদমন-প্রসঙ্গে', *সিগমুন্ড ফ্রয়েড*, (সম্পাদক: পুষ্পা মিশ্র), কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১১০
৩৬ পুষ্পা মিশ্র, 'ফ্রয়েড ও রবীন্দ্রনাথ; নারীর যৌনতা' *সিগমুন্ড ফ্রয়েড*, (সম্পাদক: পুষ্পা মিশ্র), কলকাতা, এবং মুশায়েরা, ২০১৮, পৃ. ৪৩২
৩৭ আকিমুন রহমান, *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯
৩৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০
৩৯ কল্পনা হেনা রুমি, 'বাংলাদেশের উপন্যাস : নারী-পুরুষ সম্পর্কের স্বরূপ', *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানবিকী অনুষদভুক্ত বাংলা বিভাগে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ*, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, পৃ. ৫৭
৪০ মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'বিবাহবিচ্ছেদ', *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড, (সম্পাদক: সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬, পৃ. ১৯১
৪১ আকিমুন রহমান, *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮
৪২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫
৪৩ সাহিত্য-গবেষণা বিষয় ও কৌশল (সম্পাদক: সফিকুন্নবী সামাদী, গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান ও মোঃ মেহেদী হাসান), ২০১৪, পৃ. ১৫১
৪৪ আকিমুন রহমান, *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩
৪৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭
৪৬ তসলিমা নাসরিন, *নির্বাচিত কলাম*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ১৫
৪৭ আকিমুন রহমান, *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৫